রাঢ়বাংলার চাঁদ সদাগর: চারণকবি বৈদ্যনাথ

সেখ মইনুল হক
সহকারী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, সোনামুখী কলেজ,
সোনামুখী, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ।

Abstract: চারণকবি বৈদ্যনাথ জীবনের সঙ্গে মিলিয়েছেন বিশ্বাসকে। বিশ্বাসের সঙ্গে রাজনীতিকে। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দান করলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের অধরাই থেকে গেল। অসাম্য আর দিনযাপনের গ্লানি বাঙালির মতবাদ ও চিন্তার জগতকে আলোড়িত করল। চারণকবি বৈদ্যনাথ সেই আলোড়নকে গণচেতনার স্তরে পৌঁছে দিতে বদ্ধকরিকর হলেন। কবিতার রমণীয় সৌন্দর্যবিলাসকে ত্যাগ করে জনগণের ভাষায় জণগণের জন্য কবিতা লিখতে শুরু করলেন। সেই কবিতা কেবল বইয়ের পাতায় আবদ্ধ রইলনা। পৌঁছে দিলেন মানুষের দরবারে। আজীবন দারিদ্র আর অভাবকে সঙ্গী করেও জনগরনের স্বভাব কবিত্বকে বিসর্জন দেন নি কোনোদিন।

Key word: চারণকবি, রাজনীতি, মতবাদ, গণচেতনা, জনগণের ভাষা।

১।

"চারণ" শব্দের অর্থ স্তুতি পাঠক।১ তার মানে চারণকবি শব্দের অর্থ হল , যে কবি স্তুতি পাঠ করেন । তাহলে এবারে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসবে কার বা কিসের স্তুতি ? সেই মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন ঘটমান জীবন ধারায় প্রতিদিনই দেখছি , কবি মানেই স্তুতিকার । কেউ কেউ আবার শুধু স্তুতি বাক্য দানেই তুষ্ট নন । স্তুতি করতে গিয়ে নিজের আত্ম মর্যাদাকেও বিসর্জন দিয়েছেন অনায়াসেই। এইসব দেখে-শুনে আমরা বিরক্ত বা উৎসাহিত হতেই পারি । কিন্তু স্তুতির বিরতি নেই আজও । কোথায় যেন পড়েছিলাম , ইংরেজ কবি স্যার ওয়াল্টার র‍্যালি নাকি রানি এলিজাবেথের সামনে কাদামাখা পথে নিজের গায়ের আলখাল্লা খুলে বিছিয়ে দিয়েছিলেন । এমন কবিরা হয়ত কবি খ্যাতি পান সমকালে কিন্তু কালের স্রোত তাঁদের রেয়াত করে না । অথচ আমরা সবকালেই সার্বিক সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সময় অনুভব করি "এখন পৃথিবী জুড়ে কবিতার বড় প্রয়োজন।"২

কোন কবিতার প্রয়োজন ? জীবনান্দের ভাষ্যের "কবির মনে প্রাগ্‌কল্পিত হয়ে কবিতার কলঙ্ককে যদি দেহ দিতে চায় কিংবা সেই দেহকে দিতে চায় আভা, তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না, পদ্য লিখিত হয় মাত্র, ঠিক বলতে গেলে পদ্যের আকারে সিদ্ধান্ত, মতবাদ ও চিন্তার প্রক্রিয়া পাওয়া যায় শুধু। কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পেছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে যেন। লুকিয়ে থাকে কিন্তু নিবিষ্ট পাঠক সে সংস্থা অনুভব করে; বুঝতে পারে যে তারা সংগতির ভেতর রয়েছে, অসংস্থিত হয়ে পীড়া দিচ্ছে না ।" এমন কবিতাকে অস্বীকার করবো তেমন দুঃসাধ্য আমাদের নেই । তবুও একথা বলতে দ্বিধা নেই 'সুন্দরীর কটাক্ষ' যতটা সত্য 'সুন্দরীর কটাক্ষের পেছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকা'ও ততটাই সত্য । সবকিছু নির্ভর করে সত্যটাকে কে দেখছে , আর কখন দেখছে । যখন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে প্রতিনিয়ত পাল্টে যাচ্ছে সময় আর সময়ের দাবী । তখন 'সুন্দরীর কটাক্ষ' যতই মনোরম বা হৃদয় প্রফুল্লকারী হোক না কেন , সময়ের কাছে তা বড়ই বে-মানান হবে । স্বাভাবিক ভাবে তখনই তো উচ্চারিত হবে ,

"আর্ট ফর আর্ট সেক নয় আর
ফুটপাতে পৃথিবীর ক্রন্দন
তাই আজ সম্মুখ যুদ্ধ
কোথা পাবো প্রেম ফুল চন্দন।"(চারণকবি বৈদ্যনাথ)

কারণ কবিতাই আমাদের দিতে পারে মানসিক সেই শক্তি যা বিপর্যয়ের পটভূমিতে রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানানোর সাহস দেয় । যে সাহসে ভর করে আহ্বান করতে পারি কাঙ্খিত দিনের । তাইতো যাঁদের লেখা কবিতা

পথে ঘাটে বিপর্যস্ত প্রেক্ষিত আর ঘটনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা জোগায় তাঁদের কবিতারই প্রয়োজন হয়। এই কবিরা নিভৃত কল্পনাজালকে ছিন্ন করে ব্যক্তি কবি আর প্রটাগনিস্ট একাকার হয়ে যায়। তাঁরা আমাদের আকাঙক্ষার বার্তাকে রটনা করেন দিকে-বিদিকে। তাঁরা স্তুতি করেন অসহায় মানুষের কামনাকে। তাঁরা বঞ্চিত সাধারণের চারণের ভুমিকা পালন করেন।

২।

চারণকবি বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি ,ভাট বা ভ্রাম্যমান গায়ক কবি। মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জাগাতে, দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা জোগাতে বা সমকালীন সামাজিক অসহায়তার বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করতে যেসব কবিরা গান গেয়ে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়ান। তাঁদেরকে বলা হয় 'চারণ কবি'। বাংলা সাহিত্যে চারণ কবি বলতে মুকুন্দ দাসের নাম আমরা সবাই জানি। কিন্তু ১৯৪৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত রাঢ় বাংলার যে কবি তাঁর কবিতায় গানে সমকালীন সব অন্যায় অসঙ্গতিকে আক্রমণ করে বাঙালির জীবন জীবিকার অসহায় প্রশ্নগুলিকে বারবার তুলে ধরেছেন , লাল মাটির নিষ্ঠুর আক্রোশকে সারা পশ্চিমবাংলার আকাশে বাতাসে মিশিয়ে দিয়েছেন সেই চারণকবি কেন জানিনা কালের গর্ভে চলে যাচ্ছেন। আজ যখন আমাদের চারিদিকে রাজনৈতিক অসঙ্গতি বিষনিশ্বাস ফেলছে তখন তাঁকে বড় মনে পড়ছে।

উপরের কথাগুলো যার উদ্দেশ্যে বলা তিনি চারণকবি বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৩২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর , বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরে। মৃত্যু ২০০০ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি , কলকাতার এস এস কে এম হাস্পাতালে। পিতা ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতা , লীলাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়।[৩]

আজন্ম কম্যুনিস্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন "ইতিহাসের প্রতি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিনিময়ের প্রধান পদ্ধতি এবং তার আবশ্যিক ফল যে সামাজিক সংগঠন তাই হল একটা ভিত্তি যার উপর গড়ে ওঠে সে যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাস এবং একমাত্র তা দিয়েই এ ইতিহাসের ব্যাখ্যা করা চলে; সুতরাং মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস হল শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, শোষক এবং শোষিত, শাসক এবং নিপীড়িত শ্রেণীর সংগ্রামের ইতিহাস; শ্রেণী সংগ্রামের এই ইতিহাস হল বিবর্তনের এক ধারা যা আজকের দিনে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে একই সঙ্গে গোটা সমাজকে সকল শোষণ, নিপীড়ন, শ্রেণী পার্থক্য ও শ্রেণী সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণীটি অর্থাৎ প্রলেতারিয়েত শোষক ও শাসকের, অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না।'৪ কিন্তু মুক্তি মানুষের জন্মগত অধিকার। ইংরেজ রাজশক্তি সেই অধিকারকে কেড়ে নিতে পারেনা। পরাধীন ভারতে ম্যাট্রিকুলেশনের আগেই জড়িয়ে পরলেন ছাত্র আন্দোলনে। মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে তিনি বেছে নিলেন কবিতাকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করলেন। তাঁর ভাষায় দ্বিখণ্ডিত করে "সিজার করে" জন্ম হল ভারতের। অনেক রক্ত ক্ষয় আর আত্মবিসর্জনের বিনিময়ে ভারত স্বাধীন হল , কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা এলনা মানুষের। লিখলেন ,

"ধন্য ব্রিটিশ সিংহ মামা
ধন্য স্বরাজ বিক্রেতা
ধন্য বটেন গান্ধী জহর
জিন্না প্রমুখ দেশ নেতা
কিনল স্বরাজ সস্তা দামে
ভারত মাতার বুক ফেড়ে"

স্বাধীনতা পোষা আদুরে প্রাণীর মত বুর্জোয়া শাসকদের ড্রয়িং রুমের শোভা বর্ধন করল শুধু। কিন্তু সমাজের নীচের তলার মানুষের হা-অন্ন রব বন্ধ হলনা। চমকে উঠল আশাবাদী স্বপ্নদর্শী মানুষের দল ,

"এটা কি সত্যি স্বাধীন দেশ !
অন্ন নেই বস্ত্র নেই
নেই ফুল-মধু গন্ধ-প্রেম
জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম ---"

বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করলেন প্রথম পুস্তিকা "আম কাঁঠালের ভোজ"(১৯৪৮) গ্রন্থে। ওই বছরেই প্রকাশ করলেন মিথ্যা স্বাধীনতার আস্ফালনের গানের সংকলন "ঝঙ্কার"।

রাজনৈতিক পালা বদলে স্বাধীনতা এল দেশের। কিন্তু মুক্তি ! না। যে কৃষকেরা আমাদের মুখে খাবার তুলে দেয় তাদের মুক্তি না এলে কীসের মুক্তি , কীসের স্বাধীনতা ! সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় সারাবছর অভুক্ত থাকে সেই কৃষক। তাই শুধু কলম নয় তাদের পাশে , তাদের সাথে অবস্থানের , তাদের সংগ্রামে অংশ গ্রহণেরও মানবিক ইচ্ছাকে রুপ দানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই আন্দোলনে। কৃষকেরা ৪৯সালে বিষ্ণুপুরের বাঁধগাবায় ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে সেই আন্দোলনের ওপর পুলিসের গুলিচালনার ঘটনার পর তো আর সরে থাকা যায় না। এই আন্দোলনে যোগদান করলেন আর অগ্নিবর্ষী কলমও থেমে থাকল না। "জবানবন্দী" কবিতায় লিখলেন ,

"অসাম্য আর অশুভ যেখানে
সেখানে করিনা সন্ধি
কবি লিখে যায় মুক্ত ছন্দে
কবিতা জবানবন্দী।"

আরও লিখলেন "জমি দখলের কবিতা" পুস্তিকা। এভাবেই মানুষের দাবী উঠে এল তাঁর কলমে। ১৯৫১ সালে কোচবিহারের খাদ্য আন্দোলনের সপক্ষে লিখলেন "খাদ্য দে''।

৩।

ষোড়শ শতকের শেষার্ধ থেকে শ্রীনিবাস আচার্যের কল্যানে যতই প্রেম যমুনার উত্তাল ঢেউ বিষ্ণুপুরের বুক ছুঁয়ে বাঁকুড়ার জনজীবনে এসে লাগুক না কেন , লালমাটির কঠিন কঠোর জীবনচর্যা অন্যায়কে কখনই মেনে নেয়নি। হোক না সে অসম লড়াই ! চুয়াড় বিদ্রোহে (১৭৬৬-৭২), সাঁওতাল বিদ্রোহে (১৮৫৫) জীবন বাজি রেখে তার স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে তা বারবার প্রমাণিত। এই ইতিহাস যে বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে। তাই যেখানেই অসঙ্গতি সেখানেই তাঁর অনিবার্য অংশগ্রহণ।

১৯৫৩ সালের ট্রামের ভারা বৃদ্ধির প্রতিবাদে "ট্রামের চাকা বন্ধ রে" কবিতা পুস্তিকা রচনা করে কলকাতায় গ্রেপ্তার বরণ। "হ্যান্ডবিল" কবিতায় লিখলেন ,

"আর কত দিন সইবো মা
দুঃখের বোঝা বইবো মা
গর্জে ওঠে কলম আমার ছন্দরে
ট্রামের চাকা বন্ধরে।"

ওই বছরেই বার্নপুরের শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে "প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি" প্রকাশ। ১৯৫৪ শিক্ষক ধর্মঘটের সমর্থনে কবিতা রচনা করলেন।

"শিক্ষক আজ পায়না রুটির দাম
পথে ঘাটে তাই জমে ওঠে সংগ্রাম।"

"বিহারের বঙ্গভাষী অঞ্চলকে বঙ্গভুক্তির ন্যায্য দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ উপস্থাপিত বাংলা-বিহার অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৯৫৬সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি। প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল পুরুলিয়া। বিক্ষোভে উত্তাল মানভূমের লোকসেবক সঙ্ঘ বঙ্গ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ..... নানা আলোচনা, দর-কষাকষির মাধ্যমে অবশেষে মানভূম জেলার অবলুপ্তি হয়েছিল। ধানবাদ, বোকারো প্রভৃতি এলাকাকে বাদ দিয়ে গঠন করা হয়েছিল পুরুলিয়া জেলা।"৫ এই চক্রান্তকে মেনে নিতে পারেন নি। গর্জে উঠেছিল তাঁর কলম।

"বাংলা বিহার যুক্ত করার
কালপেঁচাদের বিবৃতি
পড়ছি এবং শুনছি এবার
সর্বনাশের কূটনীতি।"

১৯৫৬ সালের ২১ শে জানুয়ারি লিখেছিলেন "বঙ্গ আমার জননী আমার" কবিতা পুস্তিকা এবং পরে "খোলা চিঠি প্রধানমন্ত্রীকে" নামে কবিতা।

তাঁর যুদ্ধ বিরোধী মানসিক অবস্থান কিন্তু আপোষহীন সংগ্রামী মানসিকতা তাঁকে সারাজীবন চালিত করেছে। ১৯৫৬ সালে যুদ্ধ বিরোধী ইস্তাহার 'দাও লিখে দাও ঘোড়ার গায়ে লাল রঙে লাল ইস্তেহার" রাঢ় বাংলার তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

"চুপ রও দেশওয়ালি সরকার
গালভরা বুলি নেই দরকার
হয় দাও ভাত রুটি বস্ত্র
নয় ছাড় আজ লালকেল্লা
মানুষ কখনও নয় ফেল্লা।"

রাঢ় বাংলার প্রকৃতি নির্ভর কৃষিতে একদিকে লালমাটির রক্তচক্ষু আর অন্যদিকে সরকারের ভ্রান্ত নীতির কল্যানে আড়তদার মজুতদারের কল্যানে ঘরে ঘরে চাল বাড়ন্ত। ১৯৫৮ সালে এই অসহায়তাকে প্রতিবাদ জানালেন "খাদ্যমন্ত্রী সমীপেষু" হ্যান্ডবিলে যার বিখ্যাত কবিতা "জবাব চাই" বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সারা ভারতকে আলোড়িত করে তুলল

"ঘরে নেই ভাত , হাঁড়ি উপোষ
কাদের দোষ
জবাব চাই
জবাব না পেলে লেখনী বন্ধ করবো নাই।"

হিন্দি অনুবাদে "জবাব দো" নামে সারা ভারতের মেহনতি মানুষের গণসংগীতে পরিণত হল।

১৯৫৯ সালে কমরেড সরোজ মুখার্জীর নির্দেশে উত্তরবঙ্গে সাংস্কৃতিক সফরে গিয়ে "রঙের গোলাম" ও "পথ" নামে দুটি স্বরচিত নাটকে সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে জনগণের আশু কর্তব্য ও সম্ভাব্য সমাধাণের পথ ও আশু কর্তব্য ব্যক্ত করলেন। ১৯৬০ সালে "দিবারাত্রির কাব্য" নামে কবিতা সংকলন প্রকাশ করে মালদহে কবিতা মেলার আয়োজন করে কবিতাকে আম জনতার কাছে পৌঁছে দেবার আয়োজন করলেন। এরপরেই এল তাঁর কবি ও ব্যক্তি জীবনের এক গভীরতর সঙ্কট। যে সঙ্কটে তাঁর কবি সত্তাটিই জয়লাভ করল। কমিউনিস্ট হলেও কবি সত্ত্বাটিকে হারান নি। তাই "সেই উনিশশো চল্লিশের দশকের শেষে ভবানী সেন সুবিখ্যাত প্রবন্ধটি লেখেন, যাহাতে ঘোষিত হয় রবীন্দ্রনাথ এক জন পুরাদস্তুর 'বুর্জোয়া' সাহিত্যিক, তাঁহার রচনা বিপথদিশারী, 'আবর্জনা'য় নিক্ষেপযোগ্য।"৬ এই ধরণের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দীঘাতে সারা বাংলা কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলনের আয়োজন করলেন এবং সেই উপলক্ষে স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এত বড় একটি কাজ ব্যক্তি উদ্যোগে করায় বসত বাড়ি বন্ধক দিয়েও সামলানো গেল না। দেনা শোধ করতে লিখলেন ,"কর্ণ সোমের ডাইরি" নামে অনু উপন্যাস।

১৯৬২ সালে "দেওয়ালের অক্ষর" কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। এরপর সাংসারিক এবং ব্যক্তিক জীবনে বিপর্যস্ত কবি কখন জ্যোতিষ শিখেছেন , চর্চা করেছেন। কখন মা কালীর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে কখনও তারাপীঠে কখনও বাড়িতেই ধ্যানমগ্ন হয়েছেন। কখনও বিষ্ণুপুরে কবিগানের দল গরেছেন কখনও তর্জা গানের দল গঠন করেছেন। মনে হয় এই পর্বে মানসিক স্থিতির অভাবে নিজেকে অন্বেষণ করেছেন কবি। কিন্তু কবিতার জন্য যার জন্ম তিনি অন্য ক্ষেত্রে অতিথি হতে পারেন , বাসিন্দা কখনই নয়। তাই আবার ফিরে এসেছেন সক্ষেত্রে। তাঁকে যে বাঙালির বড় প্রয়োজন। তাই আবার শুরু করলেন যেখানে থেকে চলে গিয়েছিলেন তারপর থেকে। ১৯৭০ সালে প্রথম গ্রন্থ আকারে পোস্টার কবিতা প্রকাশ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের স্বপক্ষে "বাংলা মা" নামে কাব্য গ্রন্থের প্রকাশ। এই গ্রন্থের "আমারি বাংলা ভাষা" কবিতায় লেখেন ,

"মানুষের জয়ধ্বনি
যে ভাষায় চিরন্তনী
সে ভাষার জন্যে যারা

ঢেলেছেন রক্তধারা
তাঁরা সব প্রনম্য যে ...”

যা দুই বাংলায় আলোড়ন তুলেছিল । বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আর এক প্রস্থ শুরু হল পূর্ব বঙ্গ থেকে বাঙালীর অভিবাসন । পুনর্বাসনের দাবীতে আন্দোলন শুরু হলে তিনি অংশ গ্রহণ করে ১৯৭২ সালে কারাবরণ করলেন । মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের ২০ ডিগ্রি সেলে বন্দি অবস্থায় রাজনৈতিক বন্দীদের দাবীতে অনশন শুরু করলেন । লিখলেন অনেক কবিতা ।

“এই কি জীবন ফাঁসি পরার ?
জেল হাজতের এই কি দাম ?
আন্দামানে নির্বাসনের
এই কি উচিত দাম পেলাম ?”

অবশেষে মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে ১৯৭৩ সালে জেলে বসে লেখা কবিতার ফোল্ডার প্রকাশ করলেন “কবিপত্র” নামে । ১৯৭৪ সালে “নকশাল আন্দোলন” নামে তাদের সমর্থনের কবিতা লিখে সরকারের বিষ দৃষ্টিতে পড়লেন । ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা শুরু হলে তাঁর লেখার উপর সেন্সরশিপ চালু হলে লিখলেন “জঙ্গলের ছড়া” । ১৯৭৬ সালে বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ “বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস ইত্যাদি”র প্রকাশ সমালোচক সমাজে আদৃত হল । ১৯৭৮ “রাজনৈতিক কবিতা” গ্রন্থের প্রকাশ বিদ্দজনেদের প্রশংসা লাভ করল । ১৯৮২ সালে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রায় অন্য ধারার কাব্যগ্রন্থ “রূপশালী মেয়ে”। “রাঢ়ের নিসর্গাশ্রিত গ্রামজীবন ও মনো-মধুরিমার চিত্রিত সার নির্যাস । এবং আমাদের শত বিবরণেও যা সম্ভবপর হয়নি , কয়েকটি মুহূর্তের ছন্দময় বানীবিন্যাসে তিনি সেই অসাধ্য সাধন করেছেন ।”৭ এই কাব্যের “নূপুর বোস্‌টুমি” কবিতায় তিনি লিখলেন রোমান্টিকতার এক নতুন ভাষ্য ।

“দুহাত তুলে দিচ্ছি তোকে রাধা নামের বাঁশি
নীল যমুনার জল
কদমতলার জমি
তুই আমাকে না দিস কিছু , নাই বা দিলি
নূপুর বস্‌টুমি ।”

১৯৮৪ সালে চারণ কবি বৈদ্যনাথে কাব্যগ্রন্থ (১ম খণ্ড) প্রকাশ পেল । ১৯৮৯ সালে “বৈদ্যনাথের পদ্য” প্রকাশিত হল । ১৯৯৪ সালে কবির নির্বাচিত কাবিতার সংকলন “মাটিতে হৃদয় আকাশে দৃষ্টি” প্রকাশিত হল । ১৯৯৯ সালে বিষ্ণুপুর বইমেলায় প্রকাশিত হয় “শীতলপাটি” কাব্যগ্রন্থ ।

৪।

কেবল কবিতাতেই তিনি বিপ্লবী মানসিকতার প্রকাশ করেননি । বিপ্লবকে তিনি লালন করতেন অন্তরে । তাই নিজের বিশ্বাসকে কেবল কবিতায় নয় ব্যক্তিগত কাজের মধ্যেও প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না । কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন , “তোমার কবিতায় নজরুলের ঝাঁজ । দারুন তেজী তেজী ভাষা । তুমি হচ্ছ বাংলার আর এক চারণ ।”৮ তবুও যোগ্য মর্যাদা তিনি পান নি । আবার কখনও কখনও হয়ত আমরা তাঁকে অস্বীকারও করতেও পারি নি । তাই ছোট মাত্রায় হলেও স্বীকৃতি কখনও কখনও তাঁকে দিয়ে স্বীকৃতিকে সম্মানিত করেছি । ১৯৯০ সালে “দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি” আয়োজিত কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক উৎসবে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান লাভ করেছেন । ১৯৯২ সালে মুকুটমণিপুরের “রাইচরণ” মেলায় সম্বর্ধিত হয়েছেন । ১৯৯৩ সালে “প্রোগ্রেসিভ থিয়েটার ইউনিট” তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে বিষ্ণুপুরে। ওই বছরেই বাঁকুড়া শহরে কংগ্রেস (আই) নেতাজীর জন্মদিনে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে । কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে কবি জয় গোস্বামীর হাত থেকে গ্রহণ করেছেন “সোপান সাহিত্য পুরষ্কার”। ১৯৯৪ সালে জয়দেব কেন্দুলিতে ‘দেউল’ সাহিত্যগোষ্ঠী তাঁকে সম্বর্ধিত করে । ১৯৯৫ সালে কবি জীবনের ৫০ বছর পূর্তিতে তাঁকে “পরশুরামের কুঠার” ও “ধামসা মাদল” পত্রিকার উদ্যোগে বাঁকুড়া শহরে তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানান হয় । ১৯৯৬ সালে শান্তিনিকেতনের ‘নন্দন’ মেলায় তাঁকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় । ১৯৯৭-৯৮ সালে কেম্‌ব্রিজ থেকে “ইন্টারন্যাশান্যাল ম্যান অফ দি” ইয়ার নির্বাচিত হন । ১৯৯৯ সালে গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ রাজ্য কমিটির আয়োজনে “নজরুল-

জীবনানন্দ স্মরণ" তাঁকে সম্মাননা জানান হয়। ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য চুঁচুড়ার "দিনান্তের অন্বেষণ" পত্রিকা তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। কোতুলপুরের আবৃতিলোক সংস্থা তাঁর অসামান্য সামাজিক অবদানের জন্য তাঁকে সম্বর্ধনা জানায় । বিষ্ণুপুরের "কংগ্রেস সেবাদল" নজরুলের জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠানে তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়।

কবিতাতে যার বাঁচা মরা । কবিতাতেই যার ঘর দুয়ার তাঁর কাছে জাগতিক সংসারের কি কোন মুল্য থাকে ! ছিলও না । আজীবন দারিদ্র আর অভাবকে সঙ্গী করে বেঁচেছিলেন জীবনানন্দে।

"নাচবো গাইবো ভাসাবো প্রেমের ভেলা
এস যৌবন ডাকছে কবিতা মেলা ।"

মাথা নোয়ানি । পারিবারিক জীবনে চরম অসহায়তাকে বরণ করলেও কখনও আদর্শচ্যুত হননি । আদর্শের জন্য মিথ্যাকে মিথ্যা বলার অপরাধে সেটেলমেন্ট অফিসের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন । কিন্তু আপসের কোন মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেন নি । একথাই কি তাঁর "চাঁদ সদাগর" কবিতার আড়ালে ফুটিয়ে তুললেন ,

"জীবন যুদ্ধের মাঠে যে সৈনিক ক্ষতবিক্ষত
অথচ যে হয়নি কারোর পদানত
বুকের সত্যকে আজো বুকে আগলে রয়েছে যে সারাক্ষণ
প্রতীক্ষা জাগর
হয়ত বা তারই নাম চাঁদ সদাগর ।"

তাঁর বিশ্বাস ছিল সমকালের এই দুর্দিন সাময়িক । কারণ ,

আসল মানুষ থাকবে বেঁচে
নকল মানুষ হারিয়ে যাবে ।"

অসময় দূর হয়ে আসবে নতুন সকাল । সেই সকালে আমরা নতুন প্রজন্মকে

"কবে ফের খেলা করবে হৃদয়ের সরোবরে
এক ঝাঁক হাঁস
সাবলীল কণ্ঠে আহা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবেন জর্জ বিশ্বাস।"

আমরাও তাঁর এই আশার সঙ্গে সহমর্মী হয়েই ধারন করতে চাই জীবন । সেখানে কবিতা থাকুক । বৈদ্যনাথ থাকুন । আর থাকুক শ্রেণী শোষণহীন সমাজ । যেখানে মানুষ বাঁচবে মানুষের অধিকারে । কারণ আমরাও যে কবির মতই খুঁজে ফিরি

"মনুষ্যত্ব মূল্যবোধ যার মধ্যে আছে ষোল আনা
আমি শুধু খুঁজে ফিরি
সেই সব মানুষের
ঘরের ঠিকানা ।"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
শ্রী বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই প্রবন্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবন্ধ সংগ্রহ করে দেবার জন্য ।

তথ্যসুত্র

১। (English & Bengali Dictionary & Grammr)
২। "সাম্প্রতিক কবিতা নিকুঞ্জের আর্তকন্ঠের বিষণ্ন বুলবুল" – ডঃ ক্ষুদিরাম দাস , বৈঠকখানা (শারাদীয়া সংখ্যা-১৯৯৫) পাতা-৭১
৩। চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জী , বইপ্রকাশ , সম্মান ও পুরষ্কার – স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় / সুব্রত পণ্ডিত
৪। কার্ল মার্কস-ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, রচনা সংকলন, প্রথম খণ্ড, প্রথম অংশ, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশনালয়, মস্কো।পাতা- ২০

৫। ১০বছরেও শেষ হলো না স্মারকস্তম্ভের কাজ পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তির দিন কাটলো উপেক্ষা, অবহেলায়-গণশক্তি ২রা নভেম্বর -২০১৬
৬। সম্পাদকীয় – ২ , আনন্দবাজার পত্রিকা , ২৫ বৈশাখ ১৪২০ বৃহস্পতিবার ৯ মে ২০১৩
৭। "সাম্প্রতিক কবিতা নিকুঞ্জের আর্তকন্ঠের বিষণ্ন বুলবুল" – ডঃ ক্ষুদিরাম দাস , বৈঠকখানা (শারাদীয়া সংখ্যা-১৯৯৫) পাতা-৬৮
৮। চারণকবি বৈদ্যনাথ ও তাঁর প্রতিভা – বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় , দিনান্তের অন্বেষণ (চারণকবি বৈদ্যনাথ সংখ্যা), ৯ই এপ্রিল ২০০০ ।